ত্রয়োদশ অধ্যায়

আইন অমান্য আন্দোলন

১ ভূমিকা

১৯২২ এর ফেব্রুয়ারীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে চৌরিচৌরার দুর্ঘটনার জন্য গভীর পরিতাপ প্রকাশ করা হয় এবং গণসংগ্রাম পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কংগ্রেসের আক্রমণাত্মক কার্যধারা স্থগিত রেখে গঠনমূলক কার্য্য পদ্ধতি গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়। ১৯২২ থেকে ১৯২৭ এই ক'বছরে নেতৃত্ব আপোষের পথটি শ্রেয় বলে মনে করেন। এইভাবে হঠাৎ ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পন্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপত রায় প্রভৃতি নেতাগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।[১]

২ স্বরাজ্য দল

১৯২২-এর ডিসেম্বরে গয়াতে কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস নতুন রণকৌশল প্রস্তাব করলেন : নির্বাচনে অংশ নিয়ে, সংস্কার-আইন জাত আইনসভাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে আমরা ভিতর থেকে বানচাল করে দেব ইংরেজদের সংস্কার-আইনের প্রহসনকে। গান্ধীজীর অনুগামীরা তাতে সায় দিলেন না। তখন চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহরু, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রমুখ গঠন করলেন কংগ্রেসের মধ্যেই নতুন এক 'স্বরাজ্য দল'।[২] বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তি করে নির্বাচনে বিজয়ী হল স্বরাজ্য দল, বারবার অচল করে দিল বাংলার আইনসভাতে ইংরেজ-ভক্ত মন্ত্রিসভা দিয়ে শাসন কার্য চালাবার প্রচেষ্টাকে।

চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য দলের বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার সভাপতি এবং বীরেন্দ্রনাথ শাসমল সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। বীরেন্দ্রনাথের বাড়ীতেই স্বরাজ্য দলের মুখপত্র "ফরওয়ার্ড" চালু হয় এবং তিনি এর অন্যতম ডিরেক্টর নির্বাচিত হন। স্বরাজ্য দল থেকে কেবল যে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করবার নির্দেশ ছিল, তাই নয়, স্বায়ত্ত-শাসন সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিতেও প্রবেশের নির্দেশ ছিল। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের নির্বাচনে এ-জেলার কংগ্রেস কর্মীগণ বীরেন্দ্রনাথকে নায়ক করে জেলাবোর্ড অধিকার করেন। শাসমল এই বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। শাসমল এই পদে এসে নিরলস পরিশ্রম ও স্বার্থশূন্য সেবার দ্বারা মাত্র তিন বছরের মধ্যে অতুলনীয় কাজ করেছিলেন। এর আগে প্রায় ৪০ বৎসর ধরে জেলাবোর্ড ও লোক্যাল বোর্ড চালু হওয়া সত্বেও জেলার অধিবাসীদের শতকরা ৯৫ জন এর কাজকর্ম ও আয়-ব্যয় সম্বন্ধে কিছুই

জানতেন না। কিন্তু শাসমল নিজের অদ্ভুত কর্মক্ষমতার বলে জেলার নিরক্ষর ব্যক্তিদেরও জেলা বোর্ডের কার্য সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেন।[৩]

জেলাবোর্ডের পরিচালনায় জেলাবোর্ডের কংগ্রেস সদস্যগণ জেলার ৫টি মহকুমাতে গঠিত কংগ্রেস পরিচালিত লোক্যাল বোর্ডগুলি ছিল বীরেন্দ্রনাথের সহায়। জেলা বোর্ডকে একটি প্রাণবন্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার কাজে বীরেন্দ্রনাথ নিজে প্রাণপণ পরিশ্রম করেছেন এবং তাঁকে অকুণ্ঠ সাহায্য দিয়েছে লোক্যাল বোর্ডগুলি। সেই সময় জেলাবোর্ড ছিল জেলা কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যধারার প্রধান বাহন। সেখানে ছিল বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব, কর্মশক্তি ও বিরোধী শক্তিকে দমিত করার ক্ষমতা এবং তার সঙ্গে যুক্ত হত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেস কর্মীগণের সক্রিয় সহযোগিতা। জনসাধারণও অন্তরের সহিত বোর্ডের সকল কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। বিরোধী ব্যক্তিগণের অপপ্রচারে তাঁরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হতেন না।[৪]

৩ গঠনমূলক কার্য

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জুন দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পর বাংলার রাজনীতির নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য গান্ধীজীর একান্ত ইচ্ছা ছিল ঐ দায়িত্ব বীরেন্দ্রনাথই গ্রহণের উপযুক্ত। কিন্তু তাঁর অগোচরে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও আর কয়েকজনের বিরোধিতার কথা বীরেন্দ্রনাথের গোচরে আসায় তিনি গান্ধীজীর সাথে সাক্ষাৎও করেন নি। বাংলার নেতৃত্বও তিনি গ্রহণ করলেন না।[৫]

১৯২৫ সালের জুলাইতে মেদিনীপুর জেলার জন্য মহাত্মা গান্ধীর একটি ভ্রমণসূচী নির্দিষ্ট ছিল। ৪ঠা জুলাই থেকে ৭ই জুলাই পর্য্যন্ত তাঁর কর্মসূচী রাখা হয় – কাঁথি, মেদিনীপুর (শহর) ও খড়্গপুরের জন্য। এই সময়ে কংগ্রেসের কার্যসূচী ছিল – গঠনমূলক কার্য্য। মেদিনীপুর জেলাতে চরকা ও খদ্দর, অস্পৃশ্যতা বর্জন, সালিশ ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রভৃতি গঠনমূলক কার্য্য বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে চলছিল। মেদিনীপুরের এই কর্মোদ্যম ছিল গান্ধীজীর প্রধান আকর্ষণ।[৬]

গঠনমূলক কার্য্যগুলিকে যে ১৮ দফা কর্মসূচীতে ভাগ করা হয়েছিল সেগুলি ছিল – (১) সাম্প্রদায়িক ঐক্য (২) অস্পৃশ্যতা বর্জন (৩) মাদকতা নিবারণ (৪) খাদি (৫) অন্যান্য গ্রামীণ শিল্প (৬) গ্রাম স্বাস্থ্য (৭) বুনিয়াদি শিক্ষা (৮) বয়স্ক শিক্ষা (৯) নারী জাতির উন্নয়ন (১০) স্বাস্থ্য ও শরীর তত্ত্ব বিষয়ক শিক্ষা (১১) প্রাদেশিক ভাষা (১২) রাষ্ট্রভাষা (১৩) আর্থিক সমতা (১৪) কৃষক (১৫) শ্রমিক সংগঠন (১৬) আদিবাসী (১৭) কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ (১৮) ছাত্র সংগঠন।

মেদিনীপুর জেলার কর্মীগণ গঠনমূলক কার্য্য পদ্ধতির প্রচার ও প্রবর্তন বিষয়ে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। সমগ্রভাবে বিচার করলে দেখা যায় বাংলার কোন একটি জেলাতে স্বাধীনতা

লাভের পূর্বে ও পরে এতগুলি গঠন কর্ম সংস্থার উদ্ভব হয়নি। কোন কোন কার্য্যের জন্য হয়ত বিশেষ সংস্থা গঠিত হয়নি কিন্তু নির্দিষ্ট কার্য্যক্রম বিশেষ নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হত।[৭]

১৯২৫ থেকে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণমুখী চেহারা আবার রুদ্ররূপে প্রকাশ পেতে থাকে। বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের চাপে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের শেষে ভারতে দারুণ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। গ্রামাঞ্চলে কৃষিজাত দ্রব্যাদির মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে হ্রাস পায় অথচ কৃষকদের দেয় খাজনা ও করের বোঝা বেড়ে চলে। শহরে শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্তের মধ্যে একটি বিরাট সংখ্যা বেকার হয়ে পড়ে। এমনকি, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর যে কয়েকটি দাবি মেনে নিয়েছিল সেগুলিও একে একে কেড়ে নেয়। ফলে জাতীয় বুর্জোয়া সমেত সমস্ত জাতিই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। রাজনীতি ক্ষেত্রেও, সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী শক্তিগুলি অসন্তোষ তীব্রতর হয়ে উঠে।[৮] ১৯২৭ সালে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবীর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ নেতাগণ এই প্রস্তাবের উদ্যোক্তা ছিলেন।

এদিকে ১৯২৭ থেকেই ভারতে শ্রমিক ধর্মঘটে নতুন ব্যাপ্তি ও তীব্রতা দেখা দেয়। বোম্বাইতে কমিউনিস্ট-পরিচালিত গিরনি কামগড় ইউনিয়নের নেতৃত্বে ১৯২৮-এ কয়েক মাসব্যাপী লক্ষাধিক সূতাকল শ্রমিকের সাধারণ ধর্মঘট ও বাংলাদেশে রেলে ও চটকলে রক্তাক্ত ধর্মঘট – জাতীয় আন্দোলনে এক নতুন বিপ্লবী শক্তির আবির্ভাব ঘোষণা করে।[৯]

১৯২৮-এ কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে ঝড়ের সংকেত দেখা যায়। জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য কি – পূর্ণ স্বাধীনতা না ডোমিনিয়ন স্টেটাস ? গান্ধীজী ও পুরানো নেতারা মত দিলেন ডোমিনিয়ন স্টেটাসের পক্ষে। আর সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল, সশস্ত্র বিপ্লববাদীরা ও কমিউনিস্টরা রায় দিলেন পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে। সামান্য ভোটে গান্ধীজীর প্রস্তাব বিজয়ী হল। কিন্তু পরদিন, কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের নেতৃত্বে অর্ধলক্ষ শ্রমিকের দৃপ্ত মিছিল কংগ্রেস অধিবেশনে এসে সমর্থন জানাল পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে। কংগ্রেসের সরকারি ইতিহাসবিদ সীতারামাইয়া পর্যন্ত লিখেছেন যে, ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসের এটিই হচ্ছে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।[১০]

৪ সাইমন কমিশন

কলকাতা কংগ্রেসের পূর্বে ১৯২৭ সালের ৮ই নভেম্বর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠনের বিষয় ঘোষণা করেন। ১৯১৯ সালে ভারত শাসন বিধানে

একটি নির্দেশ ছিল যে –এই সংবিধান অনুসারে দশ বৎসর ভারত শাসনের পর এর ফল কিরূপ দাঁড়ায় তা পর্য্যালোচনার জন্য ভারতে সরেজমিনে তদন্ত হবে। কিন্তু দশ বৎসর অতীত হওয়ার পূর্বেই হয়ত বা অবস্থার চাপে উল্লিখিত সাইমন কমিশন গঠন করা হয়। কিন্তু এই কমিশনের ৭ জন সদস্যই ছিলেন ব্রিটিশ। এতে একজন ভারতবাসীকে স্থান দেওয়া হয়নি। এজন্য ভারতে বিশেষ অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ভারতের নরমপন্থী, মধ্যবপন্থী এবং চরমপন্থী সকল রাজনৈতিক দলই একযোগে সাইমন কমিশন বর্জনের সঙ্কল্প করেন। ভারতের সর্বত্র কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বহু সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশক্রমে সাইমন কমিশন ভারতে পৌঁছিবার দিন সমগ্র ভারতে এবং যেদিন যে শহরে কমিশন উপস্থিত হবেন সেদিন সেই শহরে হরতাল প্রতিপালিত হয়। 'সাইমন ফিরিয়া যাও' লিখিত শত শত ফেষ্টুন ও কাল পতাকা বহন করে বিশাল শোভাযাত্রাসহ নগর পরিভ্রমণ করে।[১১]

এইসব মিছিলকে হিংস্রভাবে আক্রমণ করে পুলিশ। ১৯২৮-এ লাহোরে পুলিশের লাঠিতে মারাত্মকভাবে আহত হন বৃদ্ধ জননায়ক লালা লাজপৎ রাই। কয়েকদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তার প্রতিশোধে সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁর বন্ধুরা হত্যা করেন পুলিশের অফিসার স্যান্ডার্সকে। ফেরারী অবস্থায় পালাতে সক্ষম হন ভগৎ সিং।[১২]

দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষের সম্মান ও জীবন ব্রিটিশ রাজত্বে একজন সামান্য কর্মচারীর এরূপ তুচ্ছ গণ্য হতে দেখে দেশবাসী সেদিন অনুভব করেছিল – এরূপ অসহায় অবস্থার একমাত্র প্রতিকার – 'পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ'। দেশব্যাপী এই শোক এবং বিক্ষোভের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ ভারতের সংবিধানের একটি খসড়া প্রস্তুতের জন্য ১৯২৮ সালে, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে দিল্লীতে একটি সর্বদলীয় সম্মেলনে সমবেত হন। কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলের মধ্যে স্থির হয় যে "পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার" (Full responsible Government) এর ভিত্তিতেই এটি রচিত হতে হবে। এই সিদ্ধান্ত ক্রমে পন্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে যে কমিটি গঠিত হয় – তাঁরাই একটি খসড়া সংবিধান রচনা করেন এবং এটিই "নেহরু রিপোর্ট" নামে সুপরিচিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে এই সংবিধান রচিত হয় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন বা Dominion Status এর ভিত্তিতে। তাই তরুণদের মনে এটি গ্রহণযোগ্য ছিল না।[১৩]

এই পটভূমিকাতেই ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ২২ শে ডিসেম্বর কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। নির্বাচিত সভাপতি পন্ডিত মতিলাল নেহরুকে একটি বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে আড়ম্বরের সঙ্গে সম্বর্ধনা জানানো হয়। স্বেচ্ছাসেবক দলের অধিনায়ক ছিলেন তরুণ দলের নেতা সুভাষচন্দ্র বসু। সৈন্যবাহিনীর সেনাপতির ন্যায় তাঁকে জি.ও.সি. বা সর্বাধিনায়ক নামে অভিহিত

করা হয়েছিল। কংগ্রেস বিষয়-নির্বাচনী সভাতে অনেক আলোচনার পরে নেহরু রিপোর্ট আলোচনাকালে সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত দল রিপোর্টে বর্ণিত ভারতের ঔপনিবেশিক মর্যাদা অনুমোদন না করে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীমূলক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গান্ধীজী বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাবটি কংগ্রেসের প্রকাশ্য সভায় উত্থাপন করে বলেন যে যদি নেহরু কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী শাসন সংস্কার (ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব-শাসন) এক বৎসরের মধ্যে ভারতে প্রবর্তিত না হয় তাহলে পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিতে ভারতবাসীর আন্দোলন করার কোন বাধা থাকবে না এবং তিনিও এসে সেই আন্দোলনে যোগ দেবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গান্ধীজীর মূল প্রস্তাবই গৃহীত হল।[১৪] মেদিনীপুর জেলার বহু কর্মী কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

৫ স্বাধীনতা দিবস পালন

কলকাতার কংগ্রেসের পর কিন্তু আশাপ্রদ কিছুই ঘটলো না। গান্ধীজী ও মতিলালজী বড়লাট লর্ড আরউনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কিন্তু ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন-এর প্রতিশ্রুতি বা অন্য কোনরূপ আশার কথাও পাওয়া গেল না। গান্ধীজী বললেন – এ অবস্থায় তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যই আন্দোলন করবেন। ১৯২৯ সালে ডিসেম্বর মাসে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন হল। এই অধিবেশনে পন্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে রচিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব-শাসনের রিপোর্ট (নেহরু রিপোর্ট) বাতিল বলে গণ্য হল। এই অধিবেশনে ঘোষিত হল যে কংগ্রেসের সংবিধানের ১নম্বর ধারার "স্বরাজ" শব্দের অর্থ হল – "পূর্ণ স্বাধীনতা", সুতরাং নেহরু রিপোর্ট বাতিল করে সভা অনুমোদন করছে যে এখন থেকে কংগ্রেসের সকল সদস্যই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে একাগ্রতার সঙ্গে প্রচারকার্য চালাবেন। মূল নীতি পরিবর্তনের সঙ্গে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রেখে প্রাথমিক পদক্ষেপ স্বরূপ এই কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিধানসভাগুলি সম্পূর্ণ বর্জনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কংগ্রেসের সদস্যগণকে এবং অন্যান্য সকলকে তাঁদের প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে ভবিষ্যৎ নির্বাচনে কোন অংশগ্রহণে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছে। বর্তমানে বিধানসভা ও কমিটিগুলির পদগুলিতে কংগ্রেসের সদস্যগণ যেন ইস্তফা দেন। ঐ সঙ্গেই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে সরকার উক্ত বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনে দ্বিধা করলে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের উপায়-স্বরূপ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে সারা দেশব্যাপী।[১৫]

রাত্রি দ্বিপ্রহরে বীরত্বের ইতিহাস মন্ডিত পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর নগরীতে পঞ্চ নদের অন্যতম নদ ইরাবতী তটে কংগ্রেসের এই স্মরণীয় অধিবেশনে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল। স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য প্যাণ্ডেলে প্রধান প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে ১১৫ ফুট উচ্চ একটি দণ্ড স্থাপন করা হয়েছিল। কাঁটায় কাঁটায় ৩১ শে ডিসেম্বর (১৯২৯) রাত্রি ১২টা অর্থাৎ ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারীর প্রারম্ভে সভাপতিমশাই সমবেত জনগণের তুমুল "বন্দেমাতরম", "ইনক্লাব জিন্দাবাদ", "মহাত্মা গান্ধী কি জয়" ধ্বনির মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ক'রে বললেন যে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে এক বৎসর অপেক্ষা ক'রে আজ তাঁরা স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণার সময় দর্শকদের চোখে মুখে আনন্দের যে দীপ্তি দেখা গিয়েছিল তা ভোলবার নয়। সভাপতিমশাই পতাকাকে অভিবাদ জানালেন সমগ্র জনতা তাঁর অনুসরণ করল।[১৬]

১৯২৯-এ শুরু হয় দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদার দাবিতে অনশন ধর্মঘট করেন ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, যতীন দাস ও অন্যান্য বন্দী। বন্দীদের দাবি শেষ পর্যন্ত মানতে বাধ্য হয় সরকার, কিন্তু ৬৩ দিন অনশন করে আত্মাহুতি দেন যতীন দাস। লাহোর থেকে তাঁর মরদেহ নিয়ে ট্রেনে করে কলকাতায় আসেন সুভাষচন্দ্র। সারা পথ লক্ষ লক্ষ মানুষ রেল স্টেশনে আসে শহীদকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। তাদের চোখের আগুন সংকল্প নেয় সাম্রাজ্যাবাদী দাসত্বকে ধ্বংস করার।

১৯৩০ সালের ২রা জানুয়ারী কংগ্রেস সভাপতি পন্ডিত জহরলাল নেহেরু জাতির নিকট একটি আবেদন প্রচার করেন – "কংগ্রেস প্রস্তাবের ব্যাপক প্রচার এবং তার ভাবার্থ বোঝাবার জন্য প্রাদেশিক, জেলা ও স্থানীয় কমিটিগুলির নিকট আবেদন জানাচ্ছি। ভবিষ্যতের কার্যক্রম সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটি নির্দেশ দেবেন, কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিকে আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে... পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী ভারতের দূরবর্তী গ্রামে গ্রামে পৌঁছাবার জন্য এই কমিটি ১৯৩০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী (রবিবার) একটি উৎসবের দিন (স্বাধীনতা দিবস) স্থির করেছে – ঐ দিন সমস্ত স্থানীয় সভাগুলি থেকেও স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করে শোনানো হবে।"[১৭]

১৯৩০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী ভারতের গ্রামে-গঞ্জে, পল্লীতে-জনপদে, শহরে-নগরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতা দিবস পালন করে স্বাধীনতার শপথ বাক্য (জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশিত বা প্রচারিত) পাঠ করা হল। মেদিনীপুর জেলার চির-সংগ্রামী মন জেগে উঠলো এক নতুন আবেগে। বিগত প্রায় দুই শত বৎসর ধরে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা সংগ্রামের পথে যে আশা ও আকাঙ্খা রূপ গ্রহণের জন্য ব্যাকুলভাবে অপেক্ষমান ছিল তাই এই পুণ্য দিবসে মূর্ত হয়ে উঠলো যখন, স্বাধীনতার সঙ্কল্প বা শপথ-বাক্য শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হল।

৬ আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা

ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর দাবী মেনে না নেওয়ায় স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। আইন অমান্য আন্দোলনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব গান্ধীজীর উপর দেওয়া হয়। গান্ধীজীর উপর আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব পড়লে তিনি প্রথমে লবণ আইন অমান্য করার সিদ্ধান্ত নেন। এই আইনটি ভঙ্গ করার প্রথম সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি প্রথম থেকেই আন্দোলনকে গণমুখী করতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে আন্দোলনের ভাগীদার করতে চেয়েছিলেন। লবণ আইন অমান্য বা লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করার পূর্বে গান্ধীজী ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২রা মার্চ এক চিঠিতে বড়লাট আরউইনকে লবণ সত্যাগ্রহের কথা জানান। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোন সহযোগিতার ইঙ্গিত না পেয়ে তিনি ১২ই মার্চ লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য ৭৮ জন আশ্রমবাসীকে সঙ্গে নিয়ে সবরমতী আশ্রম থেকে ডাণ্ডি (বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত গুজরাটের সমুদ্রতীরে অবস্থিত) অভিমুখে যাত্রা করলেন। ৬১ বছরের মানুষ গান্ধীজীর লবণ আইন ভঙ্গের উদ্দেস্যে পদযাত্রা ভারতবাসীর মনে এক গভীর অনুপ্রেরণা তথা সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের আশা জাগায়।[১৮]

গান্ধীজীর ডান্ডী অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে ১৯ শে মার্চ সমগ্র জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে এক সম্মেলন আহূত হয় মেদিনীপুর শহরে। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলা আইন অমান্য সমিতি (পরিষদ) গঠিত হয়। মহকুমা এমনকি থানা স্তরেও এই সমিতি গঠিত হয়, যাতে করে আইন অমান্য কর্মসূচী বিশেষ করে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন সফলতা লাভ করে। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে। কারণ, সমুদ্রের লবণাক্ত জল প্রবেশের সুযোগ এ দু'টি মহকুমায় অধিক থাকায় লবণ উৎপাদনের জন্য বহু কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুর সদর মহকুমায় লবণাক্ত জল প্রবেশের কোন সুযোগ না থাকায় এ দুটি মহকুমার কোথাও লবণ তৈরীর কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। তবে এ দু'টি মহকুমার কর্মীরা কাঁথির অন্তর্গত পিছাবনী লবণ কেন্দ্রে গিয়ে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন।[১৯] ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানার অন্তর্গত শ্যামগঞ্জে কেবল একটি বড় লবণ সত্যাগ্রহ কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। ৭ই এপ্রিল থেকে এই কেন্দ্রে লবণ উৎপাদনের কাজ শুরু হয়। দাসপুর থানা কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা ছাড়াও বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকেও প্রায় পঁচিশ জন স্বেচ্ছাসেবক

এই কেন্দ্রে যোগদান করেন। পরে ময়মনসিংহ জেলার কিছু নেতা এই কেন্দ্রকে বিশেষভাবে সাহায্য করতে থাকেন।[২০]

৭ মেদিনীপুরে আইন অমান্য আন্দোলন

৭.১ তমলুক মহকুমায় আইন অমান্য আন্দোলন

তমলুক মহকুমায় আইন অমান্য সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে মহেন্দ্রনাথ মাইতি ও সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী নির্বাচিত হন। রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের আনুকূল্যে তাঁদেরই রাজবাড়ীর একাংশে লবণ সত্যাগ্রহ শিবির স্থাপিত হয়। শিবিরের আচার্য ও উপাচার্য পদে সতীশচন্দ্র সামন্ত ও সুশীলকুমার ধাড়া নির্বাচিত হন।[২১] সমিতির সম্পাদক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী একটি গৃহ কংগ্রেস অফিস করার জন্য দান করেন।

৭.১.১ লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন

আইন অমান্য আন্দোলনের শুরু হয় লবণ আইন ভঙ্গ করার মাধ্যমে। "বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদ" সিদ্ধান্ত নেন অবিভক্ত বাংলার চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল ও মেদিনীপুরের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবে। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কর্মী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদ" এর দুই সদস্য সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজিত কুমার মল্লিক প্রথম লবণ আইন অমান্য করবার উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য তমলুকে আসেন এবং তমলুক মহকুমায় প্রথম ও প্রধান লবণ উৎপাদন কেন্দ্র রূপে নরঘাটকে চিহ্নিত করেন।[২২]

৫ই এপ্রিল ১৯৩০ ডা: প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় তমলুক যাত্রা করেন। এরা ছাড়া জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, ক্ষেমঙ্করী দেবী, চারুশীলা দেবী, প্রভাত কুমার গাঙ্গুলী, ভগবতীচরণ সোম, লালমোহন মিত্র ও অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও মকসুদ হোসেন প্রভৃতি নেতৃবর্গ তমলুকে এসে সভা করে জনসাধারণের উৎসাহ বাড়ান। জেলা আইন অমান্য সমিতির সভাপতি মহেন্দ্রনাথ মাইতি, তাঁহার সহকর্মীগণের সঙ্গে ধৃত হবার পর ললিতমোহন সিংহ ও বিনোদবিহারী দাশগুপ্ত বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদ থেকে তমলুকে আসেন।

৬ই এপ্রিল ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবকের একটি বাহিনী হংসধ্বজ মাইতির নেতৃত্বে বিরাট শোভাযাত্রা সহ তমলুক শহর থেকে বের হয়ে নরঘাট অভিমুখে পায়ে হেঁঠে যাত্রা করেন। প্রতাপচন্দ্র গুহরায় ঐদিন ৭/৮ হাজার লোকের বিরাট শোভাযাত্রা চালনা করে নরঘাট পর্য্যন্ত যান। প্রায় দুই শত সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলা ১২ মাইল পথ নির্ব্বিবাদে হেঁটে মিছিলের সঙ্গে গিয়েছিলেন।

বিকাল ৩টার সময় মিছিল নরঘাটে পৌঁছায়। ৪টার সময় ৫ জন বিশিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক – হংসধ্বজ মাইতি (নায়ক), ইন্দ্রজিৎ সিংহ, রাখালচন্দ্র নায়ক, ক্ষুদিরাম ডাকুয়া ও কুঞ্জবিহারী মাইতি প্রথম লবণ তৈরী করতে যান। লবণ তৈরীর সময় ৫ জন পুলিশ কর্মচারী সেই স্থানে এসে তৈরী লবণ নিয়ে চলে যান। ঐ দিন প্রথম তৈরী ১ তোলা লবণ ৫০০ টাকায় বিক্রী হয়েছিল। ৬ই এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত পূর্ণোদ্যমে দৈনিক প্রায় ৩০ টি কেন্দ্রে লবণ তৈরী হত। পুলিশ দৈনিক এসে হাঁড়িগুলি ভেঙ্গে দিত এবং অক্ষম হলে স্বেচ্ছাসেবকদিগকে প্রহার করত। জুন মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত পুলিশের সবরকম নির্যাতন সহ্য করেও মদ, গাঁজা প্রভৃতির দোকানে পিকেটিং ও চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলেছিল। প্রথমে কেবল স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা লবণ তৈরী হত পরে তা সর্বসাধারণের ভিতর ধীরে ধীরে প্রবেশ করে।[২৩]

এই সময়ে তমলুকে দেড় হাজারেরও বেশী ব্যক্তি কারবরণ করেছেন, শত শত ব্যক্তি নির্দয়ভাবে প্রহৃত হয়েছেন, বহু বাড়ি ভাঙা হয়েছে, বহু শস্যক্ষেত্র নষ্ট হয়েছে এবং বহু গ্রামবাসী বন্দুকের গুলিতে হতাহত হয়েছেন। তবুও এই অবস্থার মধ্যেও দেশবাসী দৃঢ় ও অটল থেকে তাদের কর্তব্য পথ থেকে বিচ্যুত হননি।

১৫ই এপ্রিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পেডি তমলুকে এসেই বিশিষ্ট নেতা অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করেন। বিচারে তাঁহার ১৪ বছর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ হয়। ঐ দিন পূর্ব্বোক্ত ভূষণচন্দ্র সামন্ত-ও গ্রেপ্তার হয়ে ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডিত হন। পুলিশ গ্রামবাসীদের স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য করতে নিষেধ করে। ১৬ই এপ্রিল লবণ প্রস্তুতের সময় দ্বিতীয় দলের নায়ক সতীশচন্দ্র সামন্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। ১৮ই এপ্রিল কংগ্রেস অফিসে খানাতল্লাসী হয়। কুমারচন্দ্র জানা ও ললিতকুমার ধাড়া বক্তৃতা করবার সময়েই গ্রেপ্তার হয়ে যথাক্রমে ৬ মাস ও ৩ মাস সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হন। ঐ দিন নরঘাটে ১৪৪ ধারা জারি হয়েছিল। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, ক্ষেমঙ্করী দাসী ও চারুশীলা দেবী ১৪৪ ধারা অমান্য করেন। সভার সময় পুলিশ জনতাকে এমনভাবে প্রহার করে যার ফলে ৭/৮ জন গুরুতরভাবে আহত হয় এবং একটি ১০ বৎসরের বালকের কপাল ফেটে অজস্র ধারায় রক্ত পড়তে থাকে। ২০ শে এপ্রিল আইন অমান্য সমিতির ডিরেক্টার চন্ডীচরণ দত্ত, বি.এল. গ্রেপ্তার হন। লবণ প্রস্তুতের সময় প্রহারের ফলে ২৩ জন লোক অচৈতন্য হয়ে পড়েন। ২২ শে এপ্রিল মহিষাদল থানায় ৩নং ইউনিয়নের অন্তর্গত রাউতুড়ী গ্রামে অন্য একটি নতুন কেন্দ্র খোলা হয়। সেখানেও পুলিশ নরঘাটের মত পূর্ণমাত্রায় দমননীতি চালায়।[২৪]

ক্রমে তমলুকবাসীদের লবণ তৈরীর কেন্দ্র বিস্তার লাভ করে। কেবলমাত্র মে মাসের মধ্যেই সমগ্র মহকুমায় ৯টি কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। যথা – নরঘাট, রাউতুড়ি, তমলুক, ডিহিগুমাই,

রাজারামপুর, রাশগাছতলা ও কেশাপাট। প্রত্যেক কেন্দ্রেই পুলিশের অত্যাচার চলেছিল এবং প্রত্যেক দিন গড়ে ৩০ থেকে ৪০ জন করে গ্রেপ্তার হতে লাগল। মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই আইন অমান্য সমিতির সভাপতি মহেন্দ্রনাথ মাইতি, সম্পাদক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও তমলুকের রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় গ্রেপ্তার হন। মহেন্দ্রবাবুর ১৫ মাস ও সতীশবাবুর ১৮ মাস কারাদন্ডের আদেশ হয়। এই সময় বাবুপুরে একটি হাঙ্গামা হয়। একদিন বাবুপুরে লবণ তৈরীর সময় পুলিশ এসে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রহার করতে থাকে, এতে জনৈক গ্রামবাসী উত্তেজিত হয়ে পুলিশের উপর ঢিল ছোঁড়ে। পরে প্রায় ১০০ সশস্ত্র পুলিশ সেখানে গিয়ে প্রত্যেক গ্রামবাসীকে প্রহার করে এবং অনেককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। প্রহারের ফলে ফনীন্দ্রনাথ সরকার নামক সত্যাগ্রহীর রক্তপাত হয়। এইসময় কৃষ্ণদাসজী তাহার একদল স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে বাবুপুরে উপস্থিত হন। তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের শিবির পুলিশের কাছ থেকে নেওয়ার জন্যে ৩ দিন প্রয়োপবেশন করেন। তৃতীয় দিনে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে ৬ মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত হন। এরূপ অত্যাচারের মধ্যেও লবণ তৈরী হচ্ছিল। এইভাবে যতিদন না পর্য্যন্ত বৃষ্টির প্রভাবে সমস্ত লবণ কেন্দ্রগুলি জলমগ্ন হয়েছিল, ততদিন পর্যন্ত এইরকম নির্যাতনের মধ্যেই লবণ তৈরী হচ্ছিল। উপরোক্ত লবণ কেন্দ্রগুলি ছাড়াও আতাপালায় (সুতাহাটা) ও উদ্ধবমালে বিপুল সমারোহে লবণ তৈরী হত। এইভাবে জুন মাসের মধ্যে সমগ্র মহকুমায় ৩০টি কেন্দ্র গঠিত হয়েছিল।

জুন মাসের প্রথম থেকেই তমলুক মহকুমার প্রায় সমস্ত মদ, গাঁজা ও তাড়ীর দোকানে পিকেটিং আরম্ভ হয়। এই সমস্ত পিকেটিং করবার অপরাধে বহু স্বেচ্ছাসেবক প্রহৃত, নির্যাতিত, নিপীড়িত হন এবং কারাবরণ করেন। ১৫ই জুন রাত্রি প্রায় ৩টার সময় বহু পুলিশ আইন অমান্য অফিস, স্থানীয় হাইস্কুল ও বর্গভীমা মন্দির ঘেরাও করে ১১ জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে বেলা ৪টার সময় প্রহার দিয়ে সকলকে ছেড়ে দেয়। এইসব পিকেটিং করবার সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের জন্য মহকুমার অধিকাংশ স্কুলে পিকেটিং করতে হয়েছিল। এর জন্য দৈনিক ১৫/২০ জন সত্যাগ্রহী প্রহৃত হন। অনেককেই কারাবরণ করতে হয়। ৫ জুলাই বিশিষ্ট কর্মী গৌরীদাস ভট্টাচার্য্য গ্রেপ্তার হয়ে ৬ মাস সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হন।[২৫]

জুন মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে সদর মহকুমার অন্তর্গত পেরাই নামক গ্রামে একদল পুলিশ উপস্থিত হয়ে একজন গর্ভবতী স্ত্রীলোককে বিনা কারণে বেদম প্রহার করে। ইহা দেখে গ্রামবাসীগণ শঙ্খধ্বনি করে। ফলে ৫/৬ হাজার লোক জড়ো হয়। এই জনতার মধ্যে থেকে জনৈক গ্রামবাসী অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কয়েকটি ঢেলা নিক্ষেপ করে। এর ফলে পুলিশ জনতার ওপর গুলি চালায়। গুলিতে ১০ জন নিহত ও প্রায় অর্দ্ধশতাধিক লোক জখম হয়। এই দশ জনের মৃত্যুর ফলে

প্রায় সকলেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। মৃতদেহগুলি শৃগাল কুকুরে ছিন্নভিন্ন করে, পরে কয়েকজন গ্রামবাসীর চেষ্টায় কোনক্রমে দাহকার্য্য শেষ হয়। সমুদ্রের নোনা জল কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় প্রবেশের সুযোগ থাকায় এই দুটি মহকুমায় বেশী লবণ তৈরীর জন্য বহু কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে।[২৬]

৭.১.২ চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন

চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ ছিল আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়। জুন মাসের শেষ ভাগ থেকে মহকুমায় চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন শুরু হয়। স্বেচ্ছাসেবকগণ গ্রামে গ্রামে গিয়ে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধের জন্য পূর্ণোদ্যমে প্রচার চালাতে থাকে। এই সময় বহু চৌকিদার পদত্যাগ করে তাদের হুদ্দাপোশাক এস.ডি.ও.এর কাছে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেন। একদিকে আইন অমান্য সমিতির ট্যাক্স বন্ধের জন্য প্রচার চলতে থাকে। অন্যদিকে পুলিশবাহিনী ট্যাক্স আদায় করবার জন্য গ্রামে গ্রামে ছুটাছুটি করতে থাকে। এই সময় বহু চৌকিদার পদত্যাগ করেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন –

নাম	থানা	গ্রাম
ক্ষেত্রমোহন দাস	তমলুক	হিজলবেড়্যা
মহেন্দ্রনাথ মাইতি	তমলুক	কুরপাই
গোপাল চন্দ্র বেরা	তমলুক	কুরপাই
শিবু দাস	তমলুক	জয়কৃষ্ণপুর
চিন্তামণি মন্ডল	তমলুক	–
অমরনাথ বাড়ী	তমলুক	খামারচক
সন্ন্যাসী সিংহ	তমলুক	হরশঙ্কর
শ্রীচরণ মন্ডল	তমলুক	–
কৃত্তিবাস দয়ালী	তমলুক	গড়কিল্লা
বিপিন চন্দ্র শাসমল	তমলুক	গড়কিল্লা
সারদা প্রসাদ দাস	তমলকু	টুল্যা
শশীভূষণ বর	তমলুক	খামারচক
ধরনী মন্ডল	তমলুক	রাজহাটী
হারু দাস	তমলুক	রসিকপুর

কৃষ্ণ দাস (দফাদার)	তমলুক	মিরিকপুর
গোবর্দ্ধন দাস	পাঁশকুড়া	পাঁশকুড়া
সারদা ঘড়া	মহিষাদল	ঘাটোয়াল
গোবর্ধন ঘড়া	মহিষাদল	টিকারামপুর
চৈতন্য মন্ডল	মহিষাদল	ইচ্ছাপুর
অমর ফকির	মহিষাদল	কাঞ্চনপুর
সতুদ্দিন মিঞা	মহিষাদল	লাইকুড়ি
হারাধন সামন্ত	মহিষাদল	রাউতুড়ি
যোগী দাস	মহিষাদল	বাড়বইচবেড়িয়া
মহেন্দ্রনাথ মাইতি	মহিষাদল	–
গোপাল চন্দ্র দিন্ডা (সহকারী পঞ্চায়েত)	মহিষাদল	রাউতুড়ি
৪নং ইউনিয়নের ১৩ জন চৌকিদার	মহিষাদল	–

এছাড়াও বহু চৌকিদার, দফাদার, আদায়কারী ও প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত পদত্যাগ করেছিলেন।

তমলুক মহকুমায় চৌকিদারি ট্যাক্স আদায়ের জন্য অন্যান্য জেলা থেকে প্রায় ৫০০ পুলিশ আনা হয়। তারা প্রতি থানায় দলে দলে গিয়ে ট্যাক্স আদায় করবার জন্য গ্রামবাসীদের প্রহার করে। তাদের বাড়ি থেকে সমস্ত জিনিস ও আসবাবপত্র ক্রোক করে নিয়ে যায়। অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে চাউলখোলা গ্রামের চৌকিদার চাকুরি ছেড়ে দেন। তাকে ধরবার জন্য সুতাহাটা থানার বড় দারোগা একদল পুলিশসহ ঐ গ্রামে উপস্থিত হয়। পুলিশ দেখে গ্রামবাসীরা শঙ্খধ্বনি করে। এতে বহুলোক সমবেত হন। বহুলোক সমবেত হতে দেখে দারোগা সকলকে চলে যেতে বলেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা চলে না গিয়ে জোরে জোরে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করতে থাকেন। এই শুনে বড় দারোগা প্রথমে পুলিশকে ফাঁকা গুলি করতে বলেন। এতে গ্রামবাসীগণ পালাতে থাকেন। দারোগা দেরী সইতে না পেরে জনতার ওপর গুলি চালান। এতে ৩ জন গুরুতরভাবে ও ১০/১২ জন সামান্য আহত হন। এই সময়েই মেদিনীপুর জেলার এ.ডি.এম. প্রায় শতাধিক পুলিশ সহ ময়না

থানায় ট্যাক্স আদায় করতে যান। গ্রামবাসীরা ট্যাক্স না দেওয়ায় উক্ত থানায় ২২টি ঘর ভস্মস্তূপে পরিণত করে দেন।[২৭]

৭.১.৩ নবম অর্ডিন্যান্সের প্রত্যুত্তর দান

নবম অর্ডিন্যান্সের প্রত্যুত্তরকল্পে তমলুক মহকুমার নিম্নলিখিত অধিবাসীগণ প্রকাশ্যে আইন অমান্য সমিতির কার্য্যের জন্য নিজেদের বসতবাড়িগুলি হাসিমুখে দান করেছিলেন। দান করবার পূর্বে তারা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকেও তা জানিয়েছিলেন। বাড়িগুলি হল –

১। কুমার চন্দ্র জানার বসতবাটী (সুতাহাটা থানার অন্তর্গত বাসুদেবপুর গ্রাম নিবাসী)।

২। পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত রাসগাছতলা নিবাসী শ্রীনাথচন্দ্র পাত্রের বসতবাটী।

৩। পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত রাসগাছতলা গ্রামের "গঙ্গামন্দির" নামক বাড়ি খানা।

৪। পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত কালিদান গ্রামনিবাসী যতীন্দ্রনাথ সাঁতরার বসতবাটী ও গোলবাড়ির পশ্চিমাংশ।

৫। পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত কেশাপাট গ্রামনিবাসী চন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বসতবাটী।

৬। সুতাহাটা থানার অন্তর্গত বাড়বাসুদেবপুর গ্রামনিবাসী ননীগোপাল কুইতির বসতবাটী।

৭। মহিষাদল থানার অন্তর্গত সরবেড়িয়া গ্রামনিবাসী শ্রীপতিচরণ বয়াল ১টি নতুন বাড়ি করে দিয়েছিলেন।[২৮]

৭.১.৪ তমলুকে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

১৯৩০-এর ৬ই এপ্রিল থেকে তমলুক মহকুমায় পুলিশের অত্যাচার চলা সত্ত্বেও ১৯৩১ সালের ২৬ শে জানুয়ারি দেশবাসীগণ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। শহরের চারদিকে পুলিশের পাহারা থাকা সত্ত্বেও প্রায় ৪০০০ লোকের শোভাযাত্রা শহরের মধ্যে প্রবেশ করে সমস্ত শহর পরিভ্রমণ করে আদালতের সামনে পতাকা উত্তোলন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পুলিশ লাঠি চালিয়েছিল। প্রায় ৩০০ লোক আহত হয়েছিলেন ও ১০০ জন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। একটি ১২ বছরের বালকের মাথা ফেটে গিয়েছিল। অনেকের হাত-পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। যে ১০০ জন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাদের প্রত্যেকেই প্রহৃত হয়েছিলেন। ঐদিন বিচারে তাদের ৪০ জনের ১ মাস ও ৩০ জনের তিন মাস করে জেল হয় ও বাকিদের প্রহার করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

মহকুমার প্রায় সমস্ত ইউনিয়নে "স্বাধীনতা দিবস" উৎসব পালিত হয়েছিল, তার মধ্যে সুতাহাটা থানার অন্তর্গত বাড়বাসুদেবপুর গ্রাম, নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত নন্দপুর গ্রাম, পাঁশকুড়া থানার কালিদান গ্রাম, তমলুক থানার ডিমারিহাট, ময়না থানার পরমানন্দপুর গ্রাম, মহিষাদল থানার

অন্তর্গত রাউতুড়ি ও ব্যাবত্তারহাট গ্রাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শোভাযাত্রায় বহু মহিলাও যোগদান করেছিলেন।[২৯]

৭.২ কাঁথি মহকুমায় আইন অমান্য আন্দোলন

কাঁথি মহকুমার আইন অমান্য সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র জানা (ইনি ঐ সময় মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন)। কুমিল্লা অভয় আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সমিতির কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। মহকুমার প্রধান লবণ সত্যাগ্রহ কেন্দ্র হয় পিছাবনী এবং কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ে মহকুমার প্রধান সত্যাগ্রহ শিবির স্থাপিত হয়। অভয় আশ্রমের অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী সত্যরঞ্জন সেন এই শিবির পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মান্না। অভয় আশ্রমের কর্মীগণ কাঁথিতে লবণ সত্যাগ্রহে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।[৩০]

ভারতের বহু স্থানের ন্যায় কাঁথি মহকুমায় ৬ই এপ্রিল লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন অত্যন্ত উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়। লবণ সত্যাগ্রহ তথা আইন অমান্য আন্দোলনের দু'টি পর্বেই (১৯৩০–৩২, ১৯৩২–৩৪) কাঁথি মহকুমাবাসী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। লবণাক্ত জলের প্রবাহধারা মহকুমার নানা স্থানে প্রবাহিত হওয়ার প্রাকৃতিক সুযোগ থাকায় এখানে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন যেমন ব্যাপকতা লাভ করে, তেমনি আইন অমান্য আন্দোলনের বহুমুখী কর্মসূচী ব্যাপকভাবে পালিত হয়। নারী পুরুষ উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই আন্দোলনে যোগদান করে সত্যাগ্রহীরূপে নানাভাবে নির্যাতিত হন। কাঁথিতে পিছাবনী (কাঁথি শহর থেকে দক্ষিণে প্রায় ৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত) এই মহকুমার প্রধান লবণ আইন অমান্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। এছাড়াও পিছাবনী খালের উভয় পাশে তেঘরি, গোপালপুর, ঠাকুরচক ইত্যাদি গ্রামে লবণকেন্দ্র খোলা হয়। এমনকি আরও বহু লবণ উৎপাদন কেন্দ্র মহকুমার বিভিন্ন থানাতে সৃষ্টি হয়।[৩১]

৬ই এপ্রিলের সকালে কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিবিরে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করে ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে বিভিন্ন জেলার সত্যাগ্রহীরা কাঁথির সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পিছাবনীর সংগ্রাম ক্ষেত্রে অভিযান করেছিলেন। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অহিংস সত্যাগ্রহীদের সংগৃহীত নামগুলি হল ঃ–

১। অভয় আশ্রম, কুমিল্লা – ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল গুহ রায়, হিমাংশু শেখর ভৌমিক, অনন্তহরি রুদ্র, রমেশচন্দ্র ধর, চঞ্চল কুমার তালুকদার, ২। বাঁকুড়া – সনৎ কুমার

ভট্টাচার্য, অহিভূষণ ঘোষাল, জগবন্ধু দত্ত, বিজয়চন্দ্র তেওয়ারী, জগদীশচন্দ্র পালিত, শ্যামলচরণ পালিত, গোলকনাথ কর্মকার, ৩। নবাবগঞ্জ, ঢাকা – প্রবোধ কুমার রায়, ৪। ত্রিপুরা – দীনেশচন্দ্র লোধ, রতিমোহন দে, প্রিয়ভূষণ দত্ত, ৫। মালিকান্দা, ঢাকা – হরিদাস সাহা, সন্তোষ কুমার ঘোষ, ৬। বাসুদেবপুর, কাঁথি – সুরেন্দ্রনাথ দাস, খেজুরী, কাঁথি – ত্রৈলোক্যনাথ ভূঞ্যা, ৭। এগরা, কাঁথি – যোগেশচন্দ্র মহাপাত্র, ৮। পটাশপুর, কাঁথি – উপেন্দ্রনাথ জানা, ৯। আঠিলাগড়ি, কাঁথি – মহিতোষ সিংহ, ১০। পাইকভেড়ি, ভগবানপুর – নগেন্দ্রনাথ বেরা, সিমুলিয়া ভগবানপুর – প্রিয়নাথ পণ্ডা, ১১। ভগবানপুর – প্রতাপচন্দ্র জানা, দেবেন্দ্রনাথ মাইতি।[৩২]

শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সত্যাগ্রহী দলকে পিছাবনী কর্মী শিবিরের প্রধান ব্যবস্থাপক ভূতেশ্বর পড়্যা এবং উমাপদ প্রধানের নেতৃত্বে একটি শোভাযাত্রা খোল, করতাল এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র সহ জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে স্বাগত জানিয়েছিলেন। উপস্থিত জনতার শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে সত্যাগ্রহীরা শিক্ষক কৃষ্ণপ্রসাদ দিন্দার উদ্যোগে আয়োজিত পিছাবনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। লবণ ক্ষেত্রে পৌঁছানোর পর প্রত্যেকে এক একটি বাঁশের ঝুড়ি ও ঝিনুক নিয়ে নিকটবর্তী বটতলার কাছাকাঠি স্থান থেকে লবণ মাটি সংগ্রহ করে বটগাছের তলায় সেগুলি স্তুপ করে রাখলেন। গর্ত কেটে যে দহ তৈরী করা হোল – তার ওপর ঘন করে খড় বিছিয়ে তার ওপর লবণ মাটি জমানো হল এবং ৩–৪ ইঞ্চি গভীর লবণাক্ত জল ওপরে ঢালা গর্তের খড়ে ঢাকা খালি অংশ থেকে একটি জল নির্গমণের পথ করে দেওয়া হল এবং লবণাক্ত মাটি চুঁইয়ে খড়ের মধ্য দিয়ে যে ঘন লবণাক্ত জল নির্গত হচ্ছিল তা নির্গমণ পথের সম্মুখে রক্ষিত কলসীতে ধরে রাখা হতে থাকলো। এই পরিষ্কার লবণ জল চুল্লীর আগুনে ফুটিয়ে লবণ তৈরীর জন্য রাখা হল। জেলাশাসক মিঃ পেডী ও বহু সিপাহী অদূরে দাঁড়িয়ে সমস্ত দৃশ্য দেখতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে জেলার আব্‌গারী সুপারিন্টেডেন্ট, জেলার পুলিশ অধিকর্তা কিড্ সাহেব, কাঁথির এ.এস.পি. সামসুদ্দোহা প্রমুখও ছিলেন। সত্যাগ্রহী দল বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে তাঁদের কাজে বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়ে শিবিরে ফিরে যান দুপুরের আহারের জন্য। বিকেলে পিছাবনির হাটতলাতে এক জনসভার আয়োজন হল। এতে সভাপতিত্ব করেন পাশের গ্রাম রসুলপুরের অধিবাসী এবং গোপালপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ঝাড়েশ্বর মাঝি।[৩৩]

পরদিন ৭ই এপ্রিল একই ভাবে 'দহ' তৈরী করে লবণ জল সংগ্রহ হতে লাগলো এবং চুল্লীর আগুনে ফুটিয়ে কিছু লবণও তৈরী হল। সমবেত জনতাসহ সত্যাগ্রহীরা জয়ধ্বনি দিলেন। নিজেদের তৈরী লবণের পুঁটলীটি হাতে নিয়ে সুরেশবাবু কিছুটা এগিয়ে যেতেই পুলিশের সহকারী সুপার দোহাসাহেব তা ছিনিয়ে নেন। তৃতীয় দিন (৮ই এপ্রিল) সকালের কাজ সেরে সত্যাগ্রহীদল

আহার ও বিশ্রামের জন্য শিবিরে চলে গেলে সিপাহীরা লাঠির আঘাতে দহ, হাঁড়ি ইত্যাদি ভেঙ্গে দিল। বিকেলের জনসভায় সিপাহীরা এগিয়ে গিয়ে লাঠি দিয়ে ধাক্কা মেরে (লাঠি-চার্জ করে) সমস্ত সমবেত জনতাকে সরিয়ে দিয়ে সরকারী দমন-নীতির পূর্বাভাষ প্রকাশ করল। কর্মী শিবির ও লবণ ক্ষেত্রের মাঝামাঝি স্থলে প্রোথিত জাতীয় পতাকা জোর করে তুলে ফেললেন স্বয়ং জেলাশাসক পেডী সাহেব। এভাবে একই দিনে পর পর চারবার পতাকা তোলা ও সরিয়ে নেওয়ার কাজ হল। চতুর্থ দিনে (৯ই এপ্রিল) সিপাহীরা দহ-গুলির ছিদ্রপথে বন্ধ করে দিয়ে লবণ-জল প্রস্তুত কাজে বাধার সৃষ্টি করে। এরপরে নতুন নতুন লবণ কেন্দ্র খোলার আয়োজন শুরু হল। গান্ধীজীও ডান্ডিতে লবণ-আইন লঙ্ঘন করেই ঘোষণা করেছিলেন সত্যাগ্রহীরা ইচ্ছামতো যেখানে পারেন লবণ প্রস্তুতের কাজে এগিয়ে যেতে পারেন।[৩৪]

১১ই এপ্রিল থেকে আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের পালা শুরু হল। পিছাবনীর সরকারী তাঁবুতেই প্রস্তুত রাখা হয়েছিল স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট গফুর সাহেবের আদালত। প্রথমেই ডঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝাড়েশ্বর মাঝী ও সুরেন্দ্রনাথ দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। এঁদের প্রত্যেককেই উক্ত আদালতের বিচারে দু'বছর জেল এবং ২৫০ টাকা জরিমানা (অনাদায়ে ৬ মাসের জেল) দেওয়া হল। আসামীরা কেউই আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নি। এঁদের লবণ তৈরী করা বা লবণ তৈরী করার জন্য প্রচার সম্বন্ধে গ্রাম্য চৌকীদার বা ঐরূপ কোন গ্রাম্য সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্যের দ্বারাই প্রমাণ হত অভিযোগগুলি। ঐ একই দিনে হাতীবেড়িয়া গ্রামের গোবিন্দ প্রসাদ ঘোড়ুই, রাধামোহন ঘোড়ুই, ভোলানাথ দাস, কালাচাঁদ জানা, গোকুল মন্ডল ও বঙ্কিম সুরকে ৩ মাস করে কারাদন্ড দেওয়া হয়। ১২ই এপ্রিল ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও একইভাবে বিচার করে ২ বৎসর কারাদন্ড এবং ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়। দোহা সাহেবের অত্যচারের পালা এর পরই শুরু হয়। দহ, হাঁড়ী, কলসীগুলি ভেঙ্গে দেওয়া, সত্যাগ্রহীদের বেত্রাঘাত করে রক্তাক্ত করা, লবণ জলে ডুবিয়ে রাখা, জামা-কাপড় ছিঁড়ে দেওয়া ও কেড়ে নেওয়া, খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করা, এক একটি দলকর্মীকে গাড়ীতে তুলে বহু দূরে ছেড়ে দিয়ে আসা ইত্যাদি শাস্তি চলতে লাগলো।[৩৫]

এইভাবে বিচারের প্রহসন শেষ হলে কর্মীদের ওপর নানান ধরনের শাস্তি যেমন শুরু হয় তেমনই সত্যাগ্রহীদের বাড়ী তল্লাসী করে বহু জিনিস লুঠ করা বা পুড়িয়ে দেওয়াও চলেছিল। ঝাড়েশ্বর মাঝি নামক নেতৃস্থানীয় সত্যাগ্রহীর জরিমানার অর্থ আদায়ের নামে ক্রোকী পরওয়ানা বের করে তাঁর বাড়ীতে পুলিশ ঢুকে ব্যবহার্য জিনিস সমস্তই লুঠ করে; ক্রোকী বহু জিনিস কাঁথি সদরে

পাঠানো হয় এবং এর পরেও তাঁর খামার বাড়ীর সমস্ত ধান ও খড়ের গাদা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

১৩ই এপ্রিল কাঁথির সরস্বতী তলাতে মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। ঐদিনই রাত্রে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং তাঁরই সাথে ত্রৈলোক্যনাথ প্রধানেরও বিচার করে ১ বছর ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডিত ও ৩০০ টাকা জরিমানা করা হয়। বসন্তকুমার দাসেরও ১ বৎসর কারাদন্ড এবং ৩০০ টাকা জরিমানা হয়। পিছাবনি লবণ কেন্দ্রের প্রধান উদ্যোক্তা ও কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ভূতেশ্বর পড়্যাকে ২৫ শে এপ্রিল গ্রেপ্তার করে এক বৎসর কারাদন্ডে দন্ডিত এবং ৩০০ টাকা জরিমানা করা হয়। কাঁথিতে সত্যাগ্রহীদের একটি মহিলা সমিতির গঠনও করা হয় জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, ক্ষেমঙ্করী রায়, শান্তি দাস, অশোকলতা দাস এবং ইন্দিরা দেবী ইত্যাদির পরিচালনায়।[৩৬]

তৎকালীন 'নীহার' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের উদ্ধৃতি থেকে পরিস্থিতির চিত্র কিছুটা উদঘাটিত হবে ঃ

"কাঁথি মহকুমায় অহিংস সংগ্রাম দমন করিবার জন্য পুলিশ অত্যাচার, মারধর, জোরজুলুম, জেল-জরিমানা, গরু ও বাছুর, ধান ও গৃহের আসবাবপত্রাদি ক্রোক, ক্রোকী ধান্যাদি পোড়াইয়া দেওয়া এবং নানা প্রকার বিভীষিকা ও ভীতি প্রদর্শন আদি চমকপ্রদ রুদ্র মূর্তির অবতারণা সত্ত্বেও অহিংস সংগ্রাম এই মহকুমার পিছাবনী ও কালিনগর পর্যন্ত এত সুবিস্তীর্ণ স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে ও এক এক দিনে রুদ্র লীলার তাণ্ডব অভিযান চলিয়াছে যে সকল স্থানের সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া লিপিবদ্ধ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

অত্যাচারটা অতি নগ্ন মূর্তিতে বৃদ্ধি পাইয়াও দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হইয়া লোককে অতিষ্ঠ করিয়া তোলায় জনসাধারণের মধ্যে সাহস, দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা দিন দিনই বাড়িয়া উঠিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর কঠোর তপস্যার ফলে এতসব উত্তেজনার কারণ সত্ত্বেও বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ দেশবাসী সকল নির্যাতন অম্লান বদনে সহ্য করিয়া সম্পূর্ণ অহিংস থাকিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ভগবানকে স্মরণ করিয়া বীরের মত মরণকে বরণ করিবার জন্যও সঙ্কুচিত হইতেছে না।"[৩৭]

পিছাবনীর নিকটবর্তী রানিবসান গ্রামে হরনারায়ণ সাহু লবণ সত্যাগ্রহীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন সন্দেহে শাস্তিস্বরূপ সরকার পক্ষ থেকে তাঁকে স্পেশাল কনস্টেবল করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তিনি রাজী না হওয়ায় তাঁর বাড়ির মহিলাদের প্রথম প্রহার করার পরে তাদের ধানের গোলায় আগুন

ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গ্রামবাসীরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল।[৩৮]

আলাদারপুট গ্রামের এক জনসভায় পদ্মানাম্নী এক তেজস্বিনী বিধবা রমনী বর্তমান আন্দোলনে 'নারী জাতীর কর্তব্য' – আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, 'সন্তানের উপর অত্যাচার চলিলে মায়েরা কিরূপে স্থির থাকিব ? এখন মায়েদের বিলাসিতা সাজে না।' খোলাখালি কেন্দ্রে ইহারই নেতৃত্বে ৫০/৬০ জন মহিলা লবণ আইন অমান্যে ব্রতী হইয়াছেন। এই সাধারণ গ্রাম্য মহিলার তেজ ও সাহস এই অঞ্চলের দেশবাসীকে বেশ উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছে।[৩৯]

কাঁথি মহকুমাতে পিছাবনি লবণ কেন্দ্রের সঙ্গে শত শত লবণ কেন্দ্র সৃষ্টি হয়েছিল মহকুমার বিভিন্ন থানাতে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় – কাঁথি শহর থেকে ৬ মাইল দূরত্ব মির্জাপুর লবণকেন্দ্র, ৫ মাইল দূরত্ব খোলাখালি লবণকেন্দ্র ও রংমালাপুর, চেঁচুড়াপুট, শুকুনিয়া, কালিনগর, বকশীষপুর, বানতলিয়া, বামুনিয়া ইত্যাদি।

ভগবানপুর থানাতে লবণ সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন বিশিষ্টনেতা নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ। মুগবেড়িয়া স্কুলের ছাত্র হৃষীকেশ গায়েন, বিনয়কৃষ্ণ হাজরা, অতুলকৃষ্ণ হাজরা, শ্রীপতি মাইতি, ভগবানপুর স্কুলের নিত্যগোপাল মাইতি এই আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন।

কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত এই ভগবানপুর থানার মধ্যে লবণাক্ত জলপূর্ণ নদী এবং খালের অভাব ছিল না। একটি উল্লেখযোগ্য লবণ কেন্দ্র গড়ে ওঠে একতারপুর খালের তীরবর্তী একতারপুরে। এখানে ৭ই এপ্রিল তারিখেই লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করা হয় ভীমাচরণ পাত্রের নেতৃত্বে। এছাড়াও বায়েন্দা, ডুমরদাঁড়ী, দহগড়া, বিভীষণপুর, পশ্চিমবাড়, মহম্মদপুর, পাইকভেড়ি, শিলাখালি, গোপীনাথপুর, কলাবেড়িয়া ইত্যাদি গ্রামেও লবণ সত্যাগ্রহ করা হয়। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্বেশ্বর মাইতি এবং বাসুদেব প্রধান পুলিশের প্রহারের ফলে এক সময় চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন।[৪০]

স্বাধীনতা সংগ্রামী হৃষীকেশ গায়েন পুলিশের কার্যকলাপ সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তারই কিছু অংশ উদ্ধৃত হল ঃ "৫ই জুলাই থেকে ৬ মাসের মধ্যে স্থায়ীভাবে পুলিশ মোতায়েন করা হইল। ৮ই জুলাই গোপীনাথপুর, নুনবাড়, বরুরভেড়ি, কুরালবাড়, চাকাচড়া, ধান্দা, জনাদাঁড়ি, নলদা, নোনানস্করপুর, কাকরা, বাড়কাশিমপুর, কোটলাউরি, ছোট দৌলতপুর, এক্তারপুর, ডিহঝাঁজরা, গোপালপুর, ঘোষপুর, জামালপুর, ভবানীপুর, ফতেপুর, নোনাঘোষপুর, লছিপুর, খাগা, গোপীমোহনবাড়, ঝাঁজরা, খামটি, ভগবানপুর, বছিপুর, কালুপুর প্রভৃতি এই থানার ৩১টি

গ্রামে পিটুনী কর (Punitive Tax) ধার্য করার পর নোটিশ জারি করে ঘোষণা করা হয়েছিল গ্রামবাসীকে পুলিশের ব্যয়ভার বহন করতে হবে। কিন্তু অত্যাচার করে পুলিশ সামান্য কর আদায় করতে সমর্থ হয়েছিল।"[৪১]

ট্যাক্স আদায়ের নামে পুলিশের যে চরম স্বেচ্ছাচারিতা আরম্ভ হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "রাস্তাঘাট জনশূন্য হইল। পাল্কী নির্মাণ শিল্পের জন্য গোপীনাথপুরের প্রসিদ্ধি আছে। পাল্কী নির্মাণের কাষ্ঠাদি জ্বালানির কার্য করিল। পুলিশ কোন পুকুরের মাছ রাখিল না এবং কোন ঘরের চাউল ইত্যাদি ভোগ্যদ্রব্য নিঃশেষ করিল। মান ইজ্জত বিপদাপন্ন হইল। যে ক্ষতি হইয়াছিল তখনকার মূল্যে তাহার পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা হইবে, যাহাদের ক্ষতি হাজার টাকার বেশী হয়, তাহারা হইলেন – শিবনারায়ণ মাইতি (নুনবাড়), কেদারচন্দ্র জানা ও যতীন্দ্রনাথ জানা (গোপীনাথপুর), মনীন্দ্রনাথ শর ও প্রভাতকুমার দিন্দা (জনাদাঁড়ি), ভূবনচন্দ্র জানা ও বিধুভূষণ মাইতি (বরুরভেড়ি), পুলিন বিহারী মাইতি ও অতুলচন্দ্র মাইতি (গোপালপুর)।'[৪২]

ভগবানপুরে লবণ প্রস্তুতকালে পুলিশের লাঠির আঘাতে উল্লেখযোগ্য আহতরা হলেন – প্রমথনাথ মান্না, গুনধর মাইতি, হারুচরণ জানা, জগদীশ দাস ও সুধীরচন্দ্র মাইতি।[৪৩]

কেলেঘাই নদীর তীরবর্তী শিউলীপুরে নারী সত্যাগ্রহীদের চেষ্টায় থানার বিশিষ্ট নারী কর্মী ধীরেন বালা দাসের নেতৃত্বে একটি লবণকেন্দ্র গড়ে ওঠে। পুলিশ এই কেন্দ্রে হানা দিয়ে সমস্ত নারী সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে গাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বহু দূরে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল।

পটাশপুর থানার কংগ্রেস কমিটি লবণ-আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে পুনর্গঠিত হয়। এই থানার মুখ্যকর্মী শশিশেখর মন্ডল মির্জাপুর বনবিহারী জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ, বাল্যগোবিন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক গোবিন্দ বাগও শিক্ষকপদ ত্যাগ করে আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। ইউনিয়নগুলিতে সক্রিয় নেতাদের মধ্যে ছিলেন – সর্বেশ্বর আচার্য, উদয়নারায়ণ মিশ্র, জয়নারায়ণ মিশ্র, প্রফুল্লকুমার শী, অধরচন্দ্র দাস, তারাপ্রসাদ বেরা, অতুলচন্দ্র কান্ডার, কালিপ্রসন্ন করণ প্রমুখ।[৪৪]

পটাশপুরের প্রতাপদিঘী কেন্দ্রে ১লা জুন থেকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন গ্রামে লুঠতরাজ আরম্ভ করেছিল। এই সংবাদে বড় কুমারদা প্রভৃতি গ্রামের ২৫০ জন থেকে ৩০০ জন গ্রামবাসী পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে প্রতাপদিঘী হাটের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। লবণ আইন অমান্যের কেন্দ্রে ইতিমধ্যে কিছু গ্রামবাসীর সমাগম হয়েছিল। সত্যাগ্রহীরা এবং গ্রামবাসীরা পুলিশ বাহিনীর প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করে অগ্রসর হওয়ার সময় পুলিশ ক্যাম্প থেকে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে জনতাকে হুঁশিয়ার করেছিলেন। জনতা ছত্রভঙ্গ না হওয়ায় একজন

কনস্টেবল খড়িকাপাটনা গ্রামের নিকটে গুলি করার ফলে বাগমারী গ্রামের রামকৃষ্ণ দাস এবং শ্রীরামপুরের কার্তিক চন্দ্র মিশ্র ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছিল।[৪৫] এ ছাড়াও গুলিবর্ষণের ঘটনায় নগেন্দ্রনাথ পণ্ডা, বিজয়কুমার পণ্ডা, রজনীকান্ত পণ্ডা, উপেন্দ্রনাথ মিশ্র, রজনীকান্ত বেরা এবং অন্যানেরা গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল। এক সপ্তাহ পরে উপেন্দ্রনাথের কলকাতা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল।[৪৬]

এগরা থানাতে "স্বাধীনতা সংগ্রামী সংঘ" নামে আইন অমান্য সমিতি গঠিত হয়েছিল। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন রাখালচন্দ্র মাইতি, সহ-সভাপতি ছিলেন নরেন্দ্রনাথ মাইতি ও সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র দাস। সংগ্রাম পরিচালকরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন হেমন্তকুমার মহাপাত্র। বালিঘাই খালের পাশে বালিঘাই, দাউদপুর, কেউটগেড়্যা, চৌমুখ, অস্থিচক প্রভৃতি স্থানে লবণকেন্দ্র খোলা হয়েছিল।[৪৭]

রামনগর থানার তেঘরিতে প্রথম লবণ কেন্দ্রটি খোলা হয়েছিল এই থানার বিশিষ্ট কর্মী ত্রৈলোক্যনাথ প্রধানের উদ্যোগে। নিকটবর্তী গ্রাম কিসমৎ হাউড়বুড়িতে একটি লবণকেন্দ্র খোলা হলে ৭০ বছর বয়স্ক গোকুলচন্দ্র মন্ডল সত্যাগ্রহীরূপে যোগ দেন।[৪৮]

খেজুরী থানার চারদিকই লবণজলে বেষ্টিত ছিল। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে হুগলী নদী, উত্তরে তেখালি খাল এবং পশ্চিমে রসুলপুর নদী সবই লবণ জলে ভরা। থানার মধ্যবর্তী খালগুলির জলও লবণাক্ত। লবণ জলের জোয়ার ভাটা লবণ মাটির পলিতে থানার বহু অংশ আবৃত। বেআইনী লবণ প্রস্তুত করে লবণ আইন অমান্যের জন্য লবণাক্ত জল ও মাটি এখানে ছিল সহজলভ্য। উল্লেখযোগ্য লবণকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল – অজয়া, টিকাশী, হেঁড়্যা, বিক্রমনগর, মৌহাটি, কুলঠা, কামার্দা, জাহানাবাদ, কুঞ্জপুর, পানখাই, অজানবাড়ী, গোপীচক প্রভৃতি স্থানে।[৪৯]

আইন অমান্য আন্দোলনে কাঁথি মহকুমায় জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে মহকুমা আইন অমান্য পরিষদ তার মুখপত্র স্বরূপ "কাঁথি মহকুমা প্রচার পত্র" নাম দিয়ে একটি বুলেটিন প্রকাশের ব্যবস্থা করে। অভয় আশ্রমের অন্যতম শিক্ষক মোহাটি গ্রামের অধিবাসী পূর্ণেন্দু শেখর ভৌমিক বুলেটিনের ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন। ঘটনার গুরুত্ব অনুসারে প্রতি সপ্তাহে অন্তত দু-তিনটি সংখ্যা প্রকাশ করা হ'ত। ঘটনার বিবরণের পাশাপাশি – সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি জনচিত্তে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করত।[৫০]

কাঁথি মহকুমার অধিবাসীরা এই আন্দোলন পরিচালনার মধ্য দিয়ে যথার্থ গণ-আন্দোলনের মহিমা প্রকাশ করেছিলেন। বর্ষাকাল এসে গেলে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জুন থেকে লবণ উৎপাদন আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। তবে ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করে সভা সমিতির চেষ্টা, আবগারী দোকানের

সামনে পিকেটিং, বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্য পিকেটিং, কর বন্ধ আন্দোলন, নিষিদ্ধ রাজনৈতিক পুস্তক বিক্রয় ও খাদি প্রচারের মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হয় (১৯৩০–৩২)।[৫১]

৭.৩ ঘাটাল মহকুমায় আইন অমান্য আন্দোলন

ঘাটাল মহকুমাতে দাসপুর থানার অন্তর্গত শ্যামগঞ্জে একটি বৃহৎ লবণ সত্যাগ্রহ কেন্দ্র খোলা হয়। এই মহকুমার লবণাক্ত জল মিশ্রিত জলের জোয়ার ভাঁটা-সমন্বিত নদী বা খালের সংখ্যা কমই ছিল। কাজেই রূপনারায়ণ নদ তীরবর্তী শ্যামগঞ্জ লবণ কেন্দ্রটি ঘাটাল মহকুমার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়। ৭ই এপ্রিল (১৯৩০) শ্যামগঞ্জে লবণ তৈরীর কাজ শুরু হয়। দাসপুর থানা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি – মন্মথকুমার মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক – বিনোদবিহারী বেরা, অরবিন্দ মাইতি এবং ঘাটাল কংগ্রেস কমিটির যতীশচন্দ্র ঘোষ, হৃষিকেশ পাইন, মোহিনীমোহন মন্ডল প্রমুখের পরিচালনায় কেন্দ্রটির কাজ সুষ্ঠুরূপে নিষ্পন্ন হতে থাকে।[৫২]

দাসপুর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ভোলানাথ ঘোষের নেতৃত্বে এই অঞ্চলের সত্যাগ্রহীদের ওপর নির্মম অত্যাচার চলে। বর্ষারম্ভে লবণ তৈরীতে অসুবিধা হবে বলে এ সময়ে লবণ-আইন-ভঙ্গ করার বদলে বিদেশীপণ্য বর্জন ও ট্যাক্স প্রদান না করার জন্যই পিকেটিং, জনসভা, মিছিল করে জনগণকে উৎসাহিত করার কাজ শুরু হয়। ১৯৩০ সালের ৩রা জুন তারিখে চেঁচুয়ার হাটে বিলেতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করা হবে বলে দাসপুর থানাতে সংবাদ আসে। তাই দারোগা ভোলানাথ ঘোষ তাঁর সহকারী অনিরুদ্ধ সামন্ত ও চারজন বন্দুকধারী সিপাহীসহ চেঁচুয়াহাটে হাজির হন – হরি নন্দীর দোকানের সামনে। সোনাখালি শিবির থেকে চারজন স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিং করতে এসে তাঁদের দ্বারা ধৃত হন। সিপাহীদের জিম্মাতে ঐ চারজনকে বন্দী করে রেখে দারোগা দোকানের সামনে বসেছিলেন। জনপ্রিয় কংগ্রেস কর্মী মৃগেন ভট্টাচার্যের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ামাত্র দারোগা অশোভন আচরণ করে তাঁকে বেত দিয়ে প্রহার করলে মৃগেনবাবুও তাঁর হাত থেকে বেত কেড়ে নিয়ে পাল্টা সেই বেত দিয়ে দারোগাকেও প্রহার করে শোধ নেন। এর ফলে দারুণ গোলমাল শুরু হয়।

হাটে সমাগত বহু লোক জমে গিয়ে হাতের সামনে যা কিছু পেয়েছিল তা দিয়েই দারোগাকে অর্ধমৃত করে ফেলে। এই সময়ে কাপড়ের এক ফেরিওয়ালা লছমন সিং একটা লোহার শাবল দিয়ে আঘাত করে দারোগাকে মেরে ফেলে পালিয়ে যায়। সহকারী দারোগা অনিরুদ্ধও এক খামারে লুকিয়ে থেকেও পার পেলো না, জনতার হাতে তারও প্রাণ গেল।

মারমুখী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ প্রচুর গুলি বর্ষণ করলো। বহু লোক নিহত হল। বহু লোককে আসামী সাব্যস্ত করে হাজতে আটকে বিচার চললো। নিম্নকোর্টের বিচারে বহু রকমের শাস্তি দেওয়া হয়, বহু লোককেই দোষী সাব্যস্ত করে। শেষে হাইকোর্টের আপীলে ৬ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড, দু'জনের ৭ বৎসর কারাদন্ড, চার জনের ২ বৎসর কারাদন্ড এবং ৪ জনের লঘু দন্ড দিয়ে বিচার পর্ব শেষ হয়। শ্যামগঞ্জ লবণ কেন্দ্রের পুলিশী অত্যাচার, বিলেতী কাপড়ের দোকানে এবং আবগারী দোকানে পিকেটিং সভা ও শোভাযাত্রা-পরিচালকদের প্রহার ও তাদের প্রতি অশোভন আচরণ, গ্রেপ্তার ও লাঞ্ছনার ব্যাপারে অগ্রদূত ভোলানাথ ঘোষ ও অনিরুদ্ধ সামন্তের হত্যার পরে গ্রামে গ্রামে যে অত্যাচার বয়ে চলেছিল তার দৃষ্টান্ত তুলনাহীন।[৫৩]

৭.৪ মেদিনীপুর সদর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমায় আইন অমান্য আন্দোলন

সদর মহকুমার কয়েকটি থানাতে লবণ আইন অমান্য হয়েছিল। সেই সব স্থানে পুলিশের অত্যাচারও প্রবল আকার ধারণ করেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের আইন অমান্য পর্বে পিংলা থানা, নারায়ণগড় থানা, খড়্গপুর শহর ও খড়্গপুর লোক্যাল থানা, দাঁতন থানা, মোহনপুর থানা, কেশিয়াড়ী থানা, কেশপুর থানা, সবং থানা, গড়বেতা থানা, শালবনি থানা ও ডেবরা থানায় বেআইনী লবণ প্রস্তুতের উপযোগী লবণ জল বা মাটি সংগ্রহ করার সুযোগ না থাকায় এই সকল থানার কর্মীরা কাঁথি বা তমলুক থানার বিভিন্ন লবণ ক্ষেত্রে আইন অমান্যে যোগদান করেছিলেন। নবগঠিত ঝাড়গ্রাম মহকুমাতেও লবণ জল বা লবণ মাটি পাওয়ার সুবিধা ছিল না, তাই এই মহকুমা লবণ প্রস্তুতের একটি কেন্দ্র হিসাবে কার্য্য করতে পারেনি। এখানকার স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরা বিদেশী পণ্য ও আবগারী দ্রব্য বর্জনের জন্য পিকেটিং করে এবং ট্যাক্স বর্জন করে আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন।

এই সময়ে আন্দোলন যত বাড়তে লাগল, ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারও তত সীমা ছাড়াল কিন্তু আন্দোলন দমার বদলে গণবিদ্রোহের চেহারা নিল। গণবিপ্লবের জোয়ার রুখবার জন্য ইংরেজরা আপোষ-মীমাংসা করতে চাইলেন গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে। ১৯৩১ এর ৫ই মার্চ বড়লাট আরউইন ও গান্ধীজীর মধ্যে স্বাক্ষরিত হল যুদ্ধবিরতির চুক্তি।[৫৪]

এই চুক্তির শর্ত অনুসারে প্রতিষ্ঠান, বসতবাড়ি প্রভৃতির উপর আরোপিত বে-আইনী ঘোষণা প্রত্যাহার, বন্দীমুক্তি, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ এবং যে সকল অঞ্চল থেকে লবণ তৈরী অথবা সংগ্রহ করা যায় সে সকল অঞ্চলের নিকটবর্তী গ্রামগুলির বসবাসকারীকে পারিবারিক

ব্যবহারের জন্য বা নিকটবর্তী গ্রামগুলির মধ্যে বিক্রয়ের জন্য লবণ তৈয়ার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই চুক্তির পরে বসন্তকুমার দাস, নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, সুরেন্দ্রনাথ দাস, বিপিনবিহারী দাস অধিকারী, ত্রৈলোক্যনাথ প্রধান, ভূতেশ্বর পড়্যা, ঝাড়েশ্বর মাঝি মুক্ত হয়েছিলেন। প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র মাল দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি লাভ করলেন।[৫৫]

গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজী বিলাতে গেলেন, কিন্তু ফিরে এলেন শূন্য হাতে।

গোল টেবিল বৈঠকে গান্ধীজীর দাবী অগ্রাহ্য হওয়ায় ২৭.১২.৩১ তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দেশবাসীকে পুনরায় লবণ আইন অমান্য করার আবেদন করেছিল। গান্ধীজী ১.১.৩২ তারিখে পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণা করেছিলেন। সরকার পক্ষ থেকে ৪.১.৩২ তারিখে তাঁকে এবং বাংলার সক্রিয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার ও কারাদন্ড দেওয়া হয়েছিল। একাধিক কংগ্রেস অফিস নেতৃবৃন্দের বাড়ী বে-আইনী ঘোষিত হয়েছিল। এ সত্ত্বেও সভা, শোভাযাত্রা, পিকেটিং, লবণ আইন অমান্য, চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন দুর্বার গতিতে চলেছিল। দিনের পর দিন পুলিশ এবং মিলিটারী Emergency Ordinance, Unlawful Investigation Ordinance, unlawful Association Ordinance প্রভৃতি দমনমূলক ব্যবস্থার দ্বারা মেদিনীপুরবাসীরা নিপীড়িত ও নিগৃহীত হয়েছিল।[৫৬]

১৯৩২ সালে লবণ আইন অমান্যের সঙ্গে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন দিবস, মহকুমা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন, নিখিল ভারত বন্দী দিবস, অস্পৃশ্যতা বর্জন, চিনি, কেরোসিন, আবগারী দোকান পিকেটিং প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লবণ আইন অমান্যের এবং পুলিশের অত্যাচারের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলঃ

২৮.২.৩২ তারিখে মহিলা সত্যাগ্রহী বাসন্তীলতা গিরিসহ ২০০ জন মহিলা, ৩০০ জন পুরুষ এবং ৬০ জন সত্যাগ্রহী ঠাকুরচক কেন্দ্রে লবণ তৈরী করে বিক্রি করেছিল। একই দিনে বাসন্তীলতা দেবীর সঙ্গে ১৫০ জন মহিলা, ১৫০ জন সত্যাগ্রহী অহল্যাবালা মাইতির নেতৃত্বে শোভাযাত্রা করে জাহানাবাদ কেন্দ্রে আইন অমান্য করেছিল। এই উপলক্ষে একটি জনসভায় প্রায় ২০০০ অধিবাসী যোগদান করেছিল।[৫৭]

১৭ই মার্চ পিতাম্বর দাসের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান লবণ সত্যাগ্রহী দল ভগবানপুরের কাঁকরা, বিভীষণপুর, মহম্মদপুরে লবণ আইন অমান্যের পরে ভীমেশ্বরী বাজারে পৌঁছেছিল। সেখানে তৈরী লবণ বিক্রয়ের সময় পুলিশ উপস্থিত হয়েছিল এবং লবণ তৈরীর স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গিয়েছিল। পথে ২০০/৩০০ জনের একটি শোভাযাত্রা তাদের অনুসরণ করেছিল। পুলিশ তাদের কাছ থেকে পতাকার সঙ্গে ১৩টি টুপি কেড়ে নিয়েছিল। থানার একজন ছোটদারোগা

এদের প্রহার করার জন্য বেত নিয়ে উপস্থিত হলে বড় দারোগা তাকে বাধা দিয়ে বলেছিল, 'ওদের মারবেন না, আগের অত্যাচারের ফলে সত্যাগ্রহীদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। কাঁথির ছেলেদের উপরে অত্যাচার করলে, শালারা ভগবানপুর জ্বালিয়ে ছাড়বে।' এরপরে সকলকে তল্লাসী করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এই সত্যাগ্রহী দল পরে বাজকুল এবং কোটবাড়ে লবণ আইন অমান্য করেছিল। ১৫.৩.৩২ তারিখে কোটবাড়ে ৫০০/৬০০ জন গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে লবণ আইন অমান্যের সমর্থনে সভা হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে এই সভায় ৬০/৭০ জন মুসলমান অধিবাসীও যোগদান করেছিল।[৫৮]

২৩.৩.৩২ তারিখে মহম্মদপুর কেন্দ্রে ৮ জন সত্যাগ্রহীর সঙ্গে মন্মথনাথ দাস লবণ তৈরীর জন্য উপস্থিত হওয়ার সংবাদে পুলিশও সকাল ৮টা থেকে ৪০ জন দফাদার, চৌকিদার ও পঞ্চায়েতের লোকজন মোতায়েন করেছিল। এদের সঙ্গে বিকাল ৩টার সময় অতিরিক্ত ৯ জন সিপাই এবং গোর্খা সৈন্য যোগ দিয়েছিল। বিকাল ৫টার সময় সত্যাগ্রহীরা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে লবণ কেন্দ্রে উপস্থিত হলে পুলিশ তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে লবণ তৈরীর কাজে নিযুক্ত সত্যাগ্রহীদের পতাকা ছিনিয়ে নিয়ে বলেছিল, 'তোরা যেমন চন্দ্র সূর্যের আলো ভোগ করিস, আমরাও সেইরূপ করি। স্বরাজ হলে তোদের মত আমরাও ভোগ করব। তোরা এখন নুন মারবি না ঘর যাবি ?' সত্যাগ্রহীদের উত্তর ছিল, 'আমরা যা করতে এসেছি তাই করব।' এরপরে লোনা জল কড়ায় ঢেলে জ্বাল দেওয়া আরম্ভ হলে পুলিশ তাদের সকলকে বেপরোয়াভাবে লাঠির আঘাতে জর্জরিত করেছিল। এই ঘটনার সময় পুলিশের নির্মম অত্যাচার অব্যাহত ছিল। কাঁথি কংগ্রেস বার্তার সংবাদের ভাষায়, 'পুলিশ যখন দেখিল এত অত্যাচার সত্ত্বেও সত্যাগ্রহীগণ এক পাও নড়িল না, তখন তাহাদিগকে কাঁটা বাঁশের লাঠি দ্বারা প্রহার করিতে করিতে ঘাড় ধাক্কা ও সবুট পদাঘাত দ্বারা রাস্তার নীচে ও খালে ফেলিয়া দেয়।' মন্মথ ও তার সঙ্গী গুনধর নামে একজন স্বেচ্ছাসেবক চলৎশক্তিহীন অবস্থায় লবণ কেন্দ্রে পড়েছিল। পুলিশের অত্যাচারে মন্মথনাথ মান্না, গুণধর মাইতি, হাড়চরণ জানা, জগদীশ দাস নামে সত্যাগ্রহীদের শরীর রক্তাক্ত ও নানা স্থানে ফুলে গিয়েছিল। অন্য এক সত্যাগ্রহী সুধীরচন্দ্র মাইতির সারা শরীর রক্তাক্ত ও আঘাতে হাত ও শরীরের নানা স্থানে ফুলে গিয়েছিল। সে ঘন ঘন মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হয়েছিল।[৫৯]

রামনগর থানার ট্যাংরামারি গ্রামে একদল ভ্রাম্যমান লবণ সত্যাগ্রহী ২১.৩.৩২ লবণ আইন অমান্য করেছিল। এরপরের দিন তারা খেরসাই যাওয়ার পথে পুলিশের নির্মম প্রহারে জর্জরিত হয়েছিল। তাদের হয়রানের জন্য রামনগর থানায় কিছুক্ষণ বসিয়ে রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

এই দল ২২.৩.৩২ তারিখে মান্দার, দেউলী, ২৪.৩.৩২ তারিখে সাদিহাটে পুনরায় আইন অমান্য করেছিল।[৬০]

খেজুরী থানার তল্লা কেন্দ্রে বাসন্তীলতা গিরির নেতৃত্বে ৮ জন স্বেচ্ছাসেবক লবণ আইন অমান্য করেছিল। যখন তারা লবণ তৈরীর কাজে ব্যস্ত ছিল থানার বড় দারোগা কয়েকজন সিপাই সহ স্বেচ্ছাসেবক সুভাষচন্দ্র সামন্তকে প্রহার করে কেন্দ্রের জাতীয় পতাকাটি নষ্ট করেছিল। ঐ সময় টিকাশী থেকে একটি শোভাযাত্রা আসতে দেখে পুলিশ তাদের তাড়া করে ছত্রভঙ্গ করার পরে লবণ কেন্দ্রে ফিরে এসেছিল এবং বাসন্তী গিরি, কুমারী নির্মলা সামন্ত, কুমারী যামিনী রায়কে আটক করে রেখেছিল। স্বেচ্ছাসেবক বনবিহারী, হরিপদকে লাথি এবং প্রহার করার পর বনবিহারীর ঘন ঘন মূর্ছা ঘটায় দারোগার জল জল চিৎকারে ২ জন সিপাই তার মুখে জল ঢেলে দিয়েছিল। একই দিনে চিঙ্গুড়দনিয়া কেন্দ্রে উমেশচন্দ্র প্রধানের নেতৃত্বে একদল সত্যাগ্রহী লবণ আইন অমান্য করার সময় একজন দারোগা কয়েকজন সিপাই সহ সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবকদের নিকট থেকে পতাকাটি ছিনিয়ে প্রথমে তাদের গ্রেপ্তার করে পরে মুক্তি দিয়েছিল। রামচক হাটে তারিনী দাস, চন্দনী মণ্ডল, আনন্দময়ী দাস, দুর্গাময়ী দাস, কালীদেবী, কুন্তলকুমারী দাস ২২.২.৩২ লবণ আইন অমান্য করেছিল। সন্ধ্যায় এক সভায় ঐ দিনে তৈরী লবণ ২ টাকা ৯ আনায় বিক্রয় হয়েছিল। এরপরে ২৩.৩.৩২ তারিখে হলুদবাড়ী খালপাড়ে একজন স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা দুটি কেন্দ্র খুলেছিল। এই দুটি কেন্দ্রে লবণ তৈরীর সময় পুলিশ উপস্থিত হয়ে হাড়ি, কড়া প্রভৃতি নষ্ট করে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল।[৬১]

কাঁথি মহকুমায় দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন ১৯৩২ সালে বর্ষার পূর্বে বন্ধ হয়েছিল। এই বৎসর কংগ্রেসের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে হরতাল ২৮, প্রকাশ্য সভা ৯৫১, বৈঠক ৯৭৩, শোভাযাত্রা ৮৭৭, পতাকা সত্যাগ্রহ ৫৮টি স্থানে ২২০, লবণ সত্যাগ্রহ ৯৮টি কেন্দ্রে ২৫০, বিদেশী বর্জনের জন্য ৫০০ দোকানে পিকেটিং, ১৪টি আবগারী দোকানে মহিলাদের পিকেটিং, ডাকঘর বর্জন সপ্তাহে ৩৪টি ডাকঘরে পিকেটিং ছাড়াও লবণ আইন অমান্যের স্মৃতিবার্ষিকী প্রভৃতি ২৬টি বিশেষ দিবস পালিত হয়েছিল।[৬২]

গ্রামাঞ্চলে ট্যাক্স বন্ধের প্রচার কার্য চালানোর জন্য পুলিশের অত্যাচার তীব্র হয়ে উঠল। ভাগ্যবন্তপুরের ভোলানাথ মহাপাত্র, বল্লুকের মাধবচন্দ্র জানা, বল্লুকহাটের গঙ্গাধর জানা, পাইকবাড়ের মহেন্দ্রনাথ আদক, রঘুনাথপুরের প্রফুল্লকুমার বসুর বাড়ীগুলি জোর করে দখল করে পুলিশ শিবির স্থাপন করা হল। কংগ্রেস সমর্থকদের বাড়ীগুলিও আক্রমণ করে সমস্ত জিনিস লুঠ করে বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হল। প্রহার এবং নানারকমের নির্যাতন চললো পুরুষ কর্মীদের ওপর

এবং মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতিও অকথ্য এবং অমানুষিক অত্যাচার যেন অতি স্বাভাবিক কার্যে পরিণত হল। যে সকল বিশিষ্ট কর্মী আত্মগোপন করে গ্রামে গ্রামে চৌকীদারী ট্যাক্স বন্ধ ও বিদেশী পণ্য বিক্রয়-বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন – তারা একে একে ধরা পড়তে লাগলেন। ডাঃ প্রফুল্লকুমার বসু, বামাপদ ভৌমিক ও রজনীকান্ত প্রামাণিক গ্রেপ্তার হলেন। সুপরিচিত কর্মী রামচন্দ্র রায় বহুদিন আত্মগোপন করে থাকার পর ধরা পড়লেন। মহকুমার অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী ও তমলুক মহকুমা বুলেটিন "মুক্তিদূত"–সম্পাদক রমেশচন্দ্র করকেও গ্রেপ্তার করা হল। ইতিমধ্যে বর্ষা শেষ হওয়ায় ট্যাক্স বর্জন আন্দোলনের পাশাপাশি লবণ-তৈরী পুনরায় শুরু করে লবণ-আইনও অমান্য করার কাজ চালানো হল।[৬৩]

ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা থানার গ্রামাঞ্চলেও বহু লোককে প্রহার ও লাঞ্ছিত করে ৬ মাস থেকে দু'বছর পর্যন্ত কারাদন্ড দেওয়া হয়েছিল। জেলা শাসক পেডী সাহেব স্বয়ং তদন্তে হস্তীবাহী পুলিশ সহ এসে অকথ্য অত্যাচার করে বহু লোকের বহু ফসল নষ্ট করে বহু লোককে গ্রেপ্তার করে কারাদন্ড দেন। পাঁশকুড়া থানার আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত, অজয় মুখার্জি, রজনীকান্ত প্রামাণিক ও কুমারচন্দ্র জানা প্রমুখ। তাঁরা থানার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বহু গ্রামে সভা-সমিতি করেন। ট্যাক্স-বন্ধ আন্দোলনকে সঠিকপথে পরিচালনার জন্য সাধারণ মানুষের মনোবল অক্ষুন্ন রাখতে তাঁরা সভা সমিতির আয়োজন করেন, স্বেচ্ছাসেবকদের উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেন – ট্যাক্স-আদায়কারীরা ট্যাক্স আদায় করতে এলে গ্রামের অধিবাসীরা ঘর-বাড়ী-সম্পত্তি ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়ার সময় যাতে তাদের মনোবল না ভেঙ্গে পড়ে কিংবা অযথা হয়রানি অথবা হিংসাত্মক পরিবেশের সৃষ্টি না হয়।[৬৪]

এই ট্যাক্স-বন্ধ আন্দোলন ১৯৩২ সালে বিশেষভাবে বিস্তৃত আকার ধারণ করেছিল। গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে কয়েক মাস আন্দোলনের যে বিরতি ঘটেছিল, ১৯৩২ সালে গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সময় হতে তা শহরাঞ্চলে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। এইভাবে ময়না থানা, কাঁথি থানা, রামনগর থানা, এগরা থানা, পটাশপুর থানা, ভগবানপুর থানা, খেজুরী থানা এবং সদর মহকুমার পিংলা, কেশপুর, গড়বেতা, সবং, নারায়ণগড়, খড়্গপুর থানা এবং মেদিনীপুর শহরে আইন অমান্য আন্দোলন জোরালো হয়েছিল। তবে সুতাহাটা, খেজুরী, পিংলা, সবং, রামনগর থানাতে ও ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানাতেই পুলিশের অত্যাচার ও গুলি বর্ষণের ফলে বহু নিরীহ ও অহিংস স্বেচ্ছাসেবক এবং গ্রামবাসী নিহত হয়েছিল, বহু মহিলা কর্মী নিগৃহীত হয়েছিল।[৬৫]

৮ মেদিনীপুরের আইন অমান্য আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

মেদিনীপুরের আইন অমান্য আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

(১) নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ।

(২) অহিংস পন্থা অবলম্বন এই আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য থাকায় অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেও সত্যাগ্রহীরা সহিংস যেমন হয়ে ওঠেননি, তেমনি সত্যাগ্রহীর পথ থেকেও তাঁরা সরে আসেননি।

(৩) মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ।

(৪) এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মেদিনীপুরবাসীদের চরম শাস্তিভোগ তথা মৃত্যুবরণ করতেও হয়েছিল।

(৫) ছাত্র সমাজের অধিক পরিমাণে অংশগ্রহণ।

(৬) আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য গ্রামাঞ্চলে পুলিশি অভিযান শুরু হয়। এই সময় নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ এবং শ্লীলতাহানির ঘটনা যথেষ্ট ঘটেছিল।

(৭) এই আন্দোলনের সূত্র ধরে সাধারণ মানুষ যে কত অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে তার পরিচয় বারবণিতার (সত্যবতী) অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করেও আন্দোলনের পথ থেকে সরে না আসার মাধ্যমে পাওয়া যায়।

মেদিনীপুরের মাটিতে আইন অমান্য আন্দোলনে যে বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়েছিল তার স্বীকৃতি মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী ও নেহেরুজীর লেখা চিঠি থেকে জানা যায়।

মহাত্মা গান্ধীর লেখা পত্র ঃ

To the People of Midnapore District

I have made myself acquainted with your condition to the extent it was possible without a local visit. I tender my congratulations for your courage and patience with which you have borne your sufferings. Out of such sufferings will be born a new nation pulsating with life. Earthly possessions are no compensation for loss of liberty. It is matter of joy that you have preferred deprivation of these to that of your liberty. I hope you will not neglect the duty of manufacturing free salt.'

Allahabd M.K. Gandhi[৬৬]

02.02.31

মেদিনীপুর সম্পর্কে পন্ডিত জওহরলালের চিঠি ঃ

Among the many places which have provided martyrs for the cause of Indian freedom, Midnapore District occupies an honourable position. It was fitting that special mention be made to it in the Resolution of Remembrance passed on the anniversary of Independence Day. I should like to tender my respectful congratulations to the brave men and women of the District who have suffered so much for the cause. Freedom will come to us. Of that there is no doubt. And the dust of the struggle subsides. We may forget many of the little episodes connected with it. But we can never forget the shining examples of heroism and sacrifice which Indian and specially India's Women have given. And we cannot forget what has happened in Midnapore District.

Allahabad, Feb. 2, 1931 Jawaharlal Nehru[৬৬]

ব্রিটিশ সরকারের দমন ও বিভেদ নীতির ফলে আইন অমান্য আন্দোলন ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ল। এই পরিস্থিতিতে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন অব্যাহত রাখা অসমীচীন মনে করলেন। আনুষ্ঠানিকভাবেও ১৯৩৪ সালের মে মাসে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তা প্রত্যাহৃত হল। এর পরে গান্ধীজী হরিজন আন্দোলনের দিকেই মনোনিবেশ করলেন।[৬৮]

তথ্যসূত্র

টীকা ঃ মূল পাঠ্যাংশ রচনায় যে সকল পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য তথ্যসূত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তা ক্রমান্বয়ে গ্রন্থপঞ্জিগত বিবরণসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

১. নরহরি কবিরাজ। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা. – ৪র্থ সং.– কলকাতা : মনীষা, ১৯৭৮। পৃ. ১৮৪।

২. মুক্তির সংগ্রামে ভারত ঃ আলেখ্য গ্রন্থ. – ২য় সং. – কলকাতা : প.ব. সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ১৯৮৯। পৃ. ৯।

৩. গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ইতিহাস : দ্বিতীয় খন্ড – আধুনিক যুগ : আধুনিক যুগের মেদিনীপুরের ইতিহাস. – মেদিনীপুর: কাকলি প্রকাশনী, ১৯৮৭। পৃ. ১৯৪।

৪. বসন্তকুমার দাস। স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর: প্রথম খন্ড. – কলকাতা : মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি, ১৯৮০। পৃ. ৩৫৬–৩৫৭।

৫. গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায়। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬।

৬. বসন্তকুমার দাস। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭।

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৭।

৮. নরহরি কবিরাজ। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

৯. মুক্তির সংগ্রামে ভারত। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

১০. পূর্বোক্ত।

১১. বসন্তকুমার দাস। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২।

১২. মুক্তির সংগ্রামে ভারত। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

১৩. বসন্তকুমার দাস। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

১৪. গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায়। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭।

১৫. পূর্বোক্ত।

১৬. বসন্তকুমার দাস। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৯।

১৮. প্রদ্যোত কুমার মাইতি। অনন্য মেদিনীপুর. – ২য় সং. – তমলুক : পূর্ব মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনী, ২০১১। পৃ. ২৬০।

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২।

২০. বসন্তকুমার দাস। প্রাগুক্ত : দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১০৪।

২১. সুশীলকুমার ধাড়া। প্রবাহ : ১ম খন্ড. – কলকাতা : দে বুক স্টোর, ১৩৮৯ ব.। পৃ. ২৬।

২২. আনন্দবাজার পত্রিকা : শারদীয়া সংখ্যা, ১৩.১০.১৯৩১। পৃ. ১২৯।

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১।

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১–১৩২।

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২।

২৬. পূর্বোক্ত।

২৭. পূর্বোক্ত।

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩।

২৯. পূর্বোক্ত।

৩০. বসন্তকুমার দাস। প্রাগুক্ত : দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১০–১১।

৩১. প্রদ্যোত কুমার মাইতি। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

৩২. নীহার, ০৮.০৪.১৯৩০।

৩৩. গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায়। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২।

৩৪. পূর্বোক্ত।

৩৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩.১০.১৯৩১। পৃ. ১৩৪।

৩৬. গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায়। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩।

৩৭. নীহার, ১৫.০৪.১৯৩০।

৩৮. পূর্বোক্ত, ২৩.০৪.১৯৩০।

৩৯. পূর্বোক্ত, ২৯.০৪.১৯৩০।

৪০. গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায়। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪।

৪১. হৃষীকেশ গায়েন। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভগবানপুর থানা. – বায়েন্দা, পূর্ব মেদিনীপুর: হৃষীকেশ গায়েন জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি, ২০১০। পৃ. ৫৭।

৪২. পূর্বোক্ত।

৪৩. কাঁথি কংগ্রেস বার্তা, সংখ্যা ২২, ২৯.০৩.১৯৩২।

৪৪. বসন্তকুমার দাস। প্রাগুক্ত : দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬১।

৪৫. সংবাদ প্রচারপত্র, সংখ্যা ৪০, ২৯.০৫.১৯৩০।

৪৬. সুনীল কুমার ঘোষ। কাঁথির পুরাবৃত্ত : প্রথম খন্ড. – কাঁথি : পুরাবৃত্ত কার্যালয়, ১৪১৯ ব.। পৃ. ১৫১।

৪৭. বসন্তকুমার দাস। প্রাগুক্ত : দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬৬।

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭।

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০।

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭।

৫১. প্রদ্যোত কুমার মাইতি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংগ্রামীদের কথা (১ম খন্ড). – তমলুক : পূর্ব মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনী, ২০১২। পৃ. ৩৪।

৫২. বসন্তকুমার দাস। প্রাগুক্ত : দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১০৪–১০৫।

৫৩. গৌরীপদ চট্টোপাধায়। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮–৩১৯।

৫৪. মুক্তির সংগ্রামে ভারত। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

৫৫. সুনীল কুমার ঘোষ। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬–১৬৭।

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮।

৫৭. নীহার, ২৪.০৩.১৯৩১।

৫৮. কাঁথি কংগ্রেস বার্তা, সংখ্যা ১৭, ০৫.০৩.১৯৩২।

৫৯. পূর্বোক্ত, সংখ্যা ২০, ২২.০৩.১৯৩২।

৬০. পূর্বোক্ত, সংখ্যা ২২, ২৯.০৩.১৯৩২।

৬১. পূর্বোক্ত।

৬২. পূর্বোক্ত।

৬৩. গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায়। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১।

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২২।

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৩।

৬৬. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩.১০.১৯৩১, পৃ. ১৮১।

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২।

৬৮. গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায়। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২।